Rajshahi University journal of arts & law Vol. 52 (2024) pp. 37-54
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0687

মঞ্চনাটকের স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা: প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ

[The Necessity of Commemorative Publications in Theatre: A Contextual Analysis]

প্রফেসর মো. আরিফ হায়দার*

Abstract

Commemorative publications preserve history; on the other hand, it provides financial support for a theatre group through advertising and sponsorship. These publications are not just about money; they help benefit theatre workers, playwrights, directors, students and teachers of the theatre departments of Universities, and audiences. Besides others, nowadays, theatrical commemorative publications are published in every country. As a result, we get all the information about world theatre. Therefore, these publications play a unique role in society. The information printed in the publication indicates the theatre group's activities. At the same time, it is about the feeling of the group. A researcher can gather the information he needs from the group's birth to the publication of the memoirs. Also, the list of all the workers associated with the party inception is available here, which is helpful for future workers. As a result, the group's collective information, a playwright, stage designer, lighting designer, costume designer, prop designer, music designer, and even make-up plans live for the next generations.

***Keywords*:** Commemorative publications, Stage drama, Poster, Preserving history.

নাট্যাঙ্গনে সংকট আসবে, আবার সেখান থেকে উত্তরণও ঘটবে। সময় সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেনা। সময় তার গতিতে চলতে থাকে, সৃষ্টি হয় তার গতিতে। সময়ের সাথে, সংকটের সাথে যুদ্ধ করে এগিয়ে যায় সৃষ্টি প্রতিনিয়ত। কোনো কর্মই সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে সকল কর্ম জড়িয়ে রয়েছে সমাজ-জীবনের সাথে। বা নাটক সমাজবন্ধ জীব মানুষেরই সৃষ্টি। 'মঞ্চনাটকের স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা: প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক আলোচনায় সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশ্লেষণ প্রতিয়মান হয়।

বাংলাদেশের মানচিত্রে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত পাঁচটি পর্ব বিভাজিত হলেও, একাত্তর থেকে নব্বই অবধি, চারটি ভাগে বিভক্ত। ১৯৭১-১৯৭৩, ১৯৭৩-১৯৭৫, ১৯৭৫-১৯৮১, ১৯৮১-১৯৯০; এই এক দশকে বাংলাদেশের নাটকের চেহারা-চরিত্র আমূল পাল্টেছে। এই সময়ের নাটকে উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। ইতিহাস মাত্র। আর এই ইতিহাসকে লালন করে চলেছে বাংলাদেশের নাট্যদলগুলি। দলের প্রযোজনার মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো। সেই সাথে নাটকের দর্শকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মঞ্চস্থ মঞ্চ নাটকের স্মরণিকা। সেই স্মরণিকা বহন করে নাটকের সারসংক্ষেপ, নাটকের সঙ্গে জড়িত সকল কলা-কুশলিদের নাম থেকে আরাম্ভ করে নেপথ্যের নানা কথা।

শিল্পবিপ্লবের শুরুর কাল থেকেই স্মরণিকা পোস্টার গণ-মাধ্যমের একটি অন্যতম মাধ্যম। প্রাথমিক ভাবে এই গণ-মাধ্যমে কোনো শিল্পজাত পণ্যের বিক্রি অথবা পণ্য সম্বন্ধে জন-সাধারনের কাছে ধারনা তৈরী করার জন্য

* প্রফেসর, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ;
ই-মেইল: haider_natok@yahoo.com

ব্যবহার করা হতো। এই মাধ্যম মূলত আউটডোর বিজ্ঞাপন। একজন বিজ্ঞাপনদাতা বা শিল্পী সাধারণ মানুষের কাছে পণ্য সম্বন্ধীয় বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এটি একটি প্রধান গণ-মাধ্যম। তবে গণ-মাধ্যমের পাশাপাশি এটি একটি শিল্প মাধ্যমও, যা শিল্পীর আবেগ, শিল্পচেতনা সর্বোপরি সমাজ চেতনাকে জন-সাধারণের কাছে তুলে ধরে। তারই প্রেক্ষিতে দেয়া যায় সময়ের সাথে সাথে বেশ কিছু সামাজিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রভাব সরাসরি প্রধান শিল্প আন্দোলনের পাশাপাশি এই শিল্প মাধ্যমও আসে। শিল্প আন্দোলনের এই প্রভাব বিভিন্ন শিল্পজাত বস্তুর মধ্যেও বর্তিত হয়, যার পশ্চিমী দেশগুলোতে বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়। স্মরণিকা পোস্টার প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানুষের শিল্প, আর তাই সমসাময়িক আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনা সরাসরি এতে প্রতিফলিত হয়। সমসাময়িক এই ধারার সমস্ত শিল্পে সচেতনভাবে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণির মানুষদের দৈনিন্দন জীবনের বিষয়টা তুলে ধার হয়। এটা ছিল শিল্পের একটি নতুন ভাষা, যা সাধারণ মানুষ এবং তাদের জীবনধারাকে প্রাধাণ্য দিয়েছিল। এই শিল্প আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রূপকথার বাস্তবতার বিপরীতে। যা পশ্চিমী সমসামায়িক বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের মূলভাব; যেমনটি 'সুরিয়ালিস্টিক' শিল্পধারায়, যা ছিল জাদুকরী বাস্তবতা (ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজাম) ধর্মী।

'ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজাম' অথবা 'রোমান্টিসিজম' আসলে বাস্তবমুখী ছিল না। রোমান্টিসিজম ছিল ক্লাসিসিজম-এর সঠিক নিয়মবন্ধতার বিরোধী। রোমান্টিকরা ক্লাসিসিজমের সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃংখলাবদ্ধ আঙ্গিকের পরিবর্তে মানুষের আবেগানুভূতিকে ও কল্পনাপ্রবণ সৃজনশীলতাকে পূর্ণ প্রাধান্য দেওয়াতে তাদের শিল্প আঙ্গিকেও পরিবর্তন ঘটে। চিত্রশিল্পী, ভাষ্কর্যবিদ, মুদ্রক-চিত্রশিল্পী, আলোকচিত্রী, চলচ্চিত্র নির্মাতা এমনকি বিজ্ঞাপনদাতাও তাদের নিজ নিজ শিল্পমাধ্যমে দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণির দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এই শিল্প আন্দোলনটি কেবলমাত্র সামাজের বাস্তবগুলো বা প্রকৃত ঘটনাগুলোই নয় এবং সামাজিক ঘটনার ত্রুটিগুলোও তুলে ধরে।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পকলা আন্দোলন ও এর বিজ্ঞাপন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে এই যুদ্ধ 'দেশাত্মবোধক যুদ্ধে' রুপান্তরিত হয়। একটি শিল্প আন্দোলন দ্বারা পরিচালিত এই ধরনের সামাজিক প্রভাব যে কোন জাতির মধ্যে বিরল। সমাজতান্ত্রিক শিল্পকলার সাফল্য পুরোটাই নির্ভর করত ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির উপর। এই শিল্প আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্তালিন যুগে শিখরে পৌঁছায়। যুদ্ধের পর স্ট্যালিন এই ধারার পোস্টার ব্যবহার করে শুধু তার দেশের মধ্যে রাজনৈতিক প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার গন্ডি সীমাবদ্ধ না রেখে সারা বিশ্ব জুড়ে তা প্রদর্শন করেন বিশেষত পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে।

ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার সোভিয়েত প্রচারমূলক যুদ্ধের পোস্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেশ কিছু পোস্টার আঁকা হয়েছিল। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও মতাদর্শের বেশ কিছু পোস্টার প্রচার করা হয়। পোস্টারগুলির ভাষা সব সময় সোভিয়েত সোসালিস্ট রিয়েলিজম, পোস্টারের দৃশ্যগত ভঙ্গিমা থেকে সরাসরি আত্মস্থ করেনি বরং এটির দ্বারা প্রভাবিত যা একটি নতুন শিল্প ভাবনার প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরও এই ধারণা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ, শিল্পী এবং অন্যান্য সৃষ্টিশীল মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৪৩ সালে চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮) এবং শীল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-১৯৭৬) বিভিন্ন সমাজবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার দুর্ভিক্ষের উপর বেশ কিছু পোস্টার এবং ছবি আঁকেন যা সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ছাপা হয়। বলা যায় সে সময়ে চিত্তপ্রসাদের আঁকা 'হাঙ্গরি বেঙ্গল' পত্রিকার মলাটটি সময়ের জোরালো রাজনৈতিক চিত্র যা সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে সাম্যবাদীদের পক্ষে তীব্র আক্রমণ করার সহায়ক হয়েছিল।

চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি, ভি.ন. সেনোয় ওকেয় পোস্টার[1]

১৯৪২ সালে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (IPTA)। এই সংগঠিনটি ছিল বামপন্থী পারকর্মিং শিল্পীদের একটি দল। চিত্তপ্রসাদ ১৯৪৩ সালে এই সংগঠনের লোগো আঁকেন। এই লোগোটি বেশ কয়েকবার পোস্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই স্মরণিকাগুলি বহন করছে ইতিহাস। উক্ত শিরোনামের মধ্য থেকে গবেষণার মধ্য দিয়ে গবেষক খুঁজে বের করবে একটি স্মরণিকার ইতিহাসের স্বাক্ষ কি ভাবে বহণ করে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেয়। নাট্যকারেরা তাঁর রচিত নাটকের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সংস্কৃতি সব কিছুকে তুলেধনের তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে।

প্রয়াসী শিল্প শংকিত যখন অসুন্দরের ছায়ায়। এগিয়ে চলা যখন বিভ্রান্ত ভুলে যাওয়া অতীত আর নষ্ট বর্তমান দ্বারা, মুখোমুখি যখন ক্লান্তিকর জীবন আর ক্লান্তিহীন পথ চলা ঠিক তখনই অনিবার্য হয়ে পড়ে দ্বন্দ্ব, সূচিত হয় কালের বিকাশের ধারা। সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নৈতিক স্খলন, সন্ত্রাস আর অপসংস্কৃতি নামক সামাজিক ব্যধি নির্মূল করার জন্য নাট্যকারের নাটক, নাট্যদলের প্রযোজনা এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ। যে স্মরণিকা বহন করে ইতিহাস। স্মরণিকা শুধু ইতিহাসই বাঁচিয়ে রাখে না। এর একটা সাহিত্য ও অর্থ মূল্যও আছে। একটি স্মরণিকা প্রকাশ কালে কিছু লেখা সংযোজিত করা হয়। সেখানে নানা লেখকের লেখা সংযুক্ত হয় এবং উক্ত নাটক বিষয়ে লিখিত হয় স্মরণিকাটিতে যা সাধারণ মানুষ বা নাট্যদর্শকের হাতে পৌঁছে দেওয়াও হয়।

নাটক দৃশ্যকাব্য। নাটককে দর্শকের সামনে উপস্থিত করতে হয় এবং দর্শকবৃন্দ তাদের মতামত সরাসরি দিয়ে থাকেন। কেউ যদি বলেন নাটক দেখে আসি। তখন চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। কেমন হতে পারে সেই ছবি? প্রথমেই কিছু দর্শকের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে, তারপর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা বা একটু (বর্তমানে) ব্যতিক্রম হলে মহিলা সমিতি। একসময় ধাপে ধাপে মনের মধ্যে তৈরি হতে থাকে একটা স্টেজ, দর্শক সারিতে বসে আছে অনেক দর্শক, কিছু ফাঁকা চেয়ার এই হলো। প্রসিনিয়াম মঞ্চ। যদি বলা হয় থিয়েটার বাড়ি তাতে কি খুব একটা ভুল বলা হবে? মঞ্চের চেহারা, এসব তো একটা নাটক দেখানোর ক্ষেত্র মাত্র। আধার-আলো, আলো-আধার বা পরিবেশের সাথে শিল্পের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যই বলা যায়। উপস্থাপনার ধরনের ভিত্তিতে নাটকের জন্য আরও অনেকগুলি নামকরণ হয়েছে যেমন থার্ড থিয়েটার, এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার (Environmental theather), পথ নাটক প্রভৃতি। এই নাটকগুলি কখনো সাধারণ আলোর মধ্যেই উপস্থাপিত হচ্ছে আবার সময় বিশেষে আলো ব্যবহার করা হচ্ছে। মঞ্চের বাইরে যখন একটা খোলা জায়গায় নাটক মঞ্চস্থ হয়

তখন দর্শকের মুখোমুখি হতে হয় পাত্র-পাত্রীর। নির্দেশক তার মতো করে জায়গাটা নির্বাচন করে নাটকটি উপস্থাপন করে। আজকের থিয়েটারের সাথে দর্শকের কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত এবং অভিনেতাদের সাথে দর্শকের সম্পর্ক কী ধরনের হওয়া উচিত সে বিষয়ে Ruth Finnegan–এর ভাগগুলি নিয়ে সৌমিত্র বসু 'আজকের অথবা আগামীকালের থিয়েটার' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন–

> 1. Clear distinction between audience and performer; 2. Audience and performers relatively separate, but without the clear barrier of; 3. General separation between audience and performers, but with some active contributions by those who otherwise perform an audience role; 4. Active participation by different participants in different roles or at different times; 5. Little or no separation between 'audience' and 'performers'; 6. Solitary performance with no apparent audience.[২]

উপরিউক্ত বিষয় নিয়ে আমাদের নাগরিক থিয়েটার ব্যাপকভাবে কতগুলি বিষয় ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের থিয়েটারের প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্নভাবে শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের থিয়েটার সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধন করেছে।

> বাংলাদেশের নাট্যশিল্পকে নতুন প্রাণ দান করেছে কতিপয় তরুণ যাঁরা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলো এবং কলকাতার 'গ্রুপ থিয়েটার'–এর কর্মকাণ্ড দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলো। কলাবরণ, ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকায় সুস্থিত ও নিয়মিত নাট্যচর্চা শুরু হয়েছে। শুধু রাজধানীতে নয়; জেলা শহরগুলিও এই ধারাস্রোতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।[৩]

বর্তমানে মঞ্চে নাটক করা একটি দলের নাট্যকর্মীদের কাছে যতটা গর্বের তেমনি দর্শকের চোখেও গর্বের। দর্শনির বিনিময়ে একটি ভালো মঞ্চ নাটক দেখার জন্য দর্শক প্রস্তুত। বাংলাদেশের মঞ্চে যেসব নাটক গণজীবন, শ্রেণি-চেতনা ও শ্রেণি-সংগ্রাম নিয়ে লেখা হয়েছে সেগুলি জনগণের কাছে মূল বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারেনি মূলত নাট্যকর্মীদের শ্রেণি চরিত্রের কারণে: ১. এই জনগণ কারা? ২. তাদের কর্মকৃতি কি সত্যই জনগণ বলতে যা বোঝায় তাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে? ৩. এবং ব্যাপকভাবে জনগণ তাদের নাট্যকর্মের প্রতি কতোটা উৎসাহ বা আগ্রহ দেখিয়েছে? দুর্ভাগ্যবশত: এ সব প্রশ্নের তেমন সৎ বা সন্তোষজনক উত্তর মিলবেনা। এবিষয়ে নাট্যকার জিয়া হায়দার 'বাংলাদেশের থিয়েটার' প্রবন্ধে লিখছেন–

> ...যেহেতু আমাদের থিয়েটার মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও কৃত্য হয়ে ওঠেনি। তবে তা শিল্পিত রূপ নিয়ে অন্যতম সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছে। গণমুখী বলে অভিহিত নাটকও সাধারণ নগর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত দর্শকদেরই দেখানো হয়ে থাকে। সত্য বলতে কি, গ্রামীণ তথা সাধারণ মানুষ নগর কেন্দ্রিক নাট্যকর্মীদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে পারেনা। নগরেই সম্পূর্ণরূপে সীমিত ও নগরের জন্যেই নিবেদিত বলে এ প্রশ্নও এসে যায় যে তাহলে সাধারণ জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশাল প্রেক্ষাপটে এসব নাট্যকর্ম আন্দোলন রূপে চিহ্নিত ও অভিহিত হতে পারে কি না? কার্যক্রমের দিক থেকে এই নাট্যকর্ম গণঅভিমুখী নয়।...[৪]

তাহলে বর্তমান নাট্যকর্মের সামগ্রিক রূপে ও স্বরূপে ব্যাপকভাবে সেসব উপাদান কতটা আছে, যার কথা বলেছেন পিসকাটর ও ব্রেখ্‌ট যা কি-না সমাজ পরিবর্তনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে বিপুলভাবে সংগ্রামের অন্তর্নিহিত শক্তি ও উদ্যম, সৃষ্টিশীলতা, বিশ্লেষণী বোধ ও ক্ষমতাকে জোরদার করতে পারে? প্রসঙ্গক্রমে, চল্লিশের দশকে ভারতের আই.পি.টি.এ. ও তার নব নাট্য-আন্দোলনের কথা মনে রাখলে বাংলাদেশের বর্তমান নাট্যকর্মকে বৃহত্তর অর্থে আন্দোলন বলা চলে না, যদিও আমাদের নাট্যকর্মীরা 'আন্দোলন' বলে উল্লেখ করে থাকেন সর্বদাই।

বাংলাদেশের নাটক যুদ্ধ, একাত্তর, স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরাজ বিদায় নিল, পরাধীন থাকা জাতির নাটক হয় না; স্বাধীনতা নামমাত্র হলেও হয় না; যে জাতি রক্তের ভেতর স্বাধীনতা অনুভব করতে না পারে সে জাতি হয়তো সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে বা সংগীতে বড় মাপের কিছু সৃষ্টি করতে পারে, নাটক তার কাছে অধরাই থেকে যায়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজ-বদলের হাতিয়ার হিসেবে। আর তখনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে মঞ্চ, পথনাটক হয়ে উঠল আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। শিল্পমাধ্যম বাংলাদেশের নাটকে পালাবদলের হাওয়া লাগল। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত আর রূপকথার মোহান্ধতার পরিবর্তে বাংলাদেশের নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠল মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ মানস। প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাটকের মৌল পার্থক্য নির্দেশ সূত্রে সমালোচকের মন্তব্য এখানে উল্লেখ্য:

> যে বিষয়বস্তু নিয়ে আগেকার নাটকগুলোর রচিত হল, সে সব বিষয় '৭১ পরবর্তী নাট্যকর্মী-দর্শকদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হল না। তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল নতুন নাট্য রচনার। আগেকার নাটকের সাথে এই নতুন নাটকের প্রধান পার্থক্য হল নাটকে এখন একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য এল। বক্তব্য ছাড়া কোনো নাটক আজকের নাট্য কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। বেশির ভাগ নাটক রচিত হল সমকালীন সমাজ নিয়ে। সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের হতাশা-বঞ্চনা, আনন্দ-উল্লাসকে উপজীব্য করে নাটক রচিত হল। ...নাট্যকাররা তাঁদের রচনায় সমাজ-সচেতনার পরিচয় দিলেন।[৫]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। নাট্যদল মঞ্চে নাটক উপস্থাপন করার সময়েই বাস্তবতা অনুভব করে নাট্যদলের প্রধান। একদিকে মিলনায়তন ভাড়া, লাইট ভাড়া, টিকেট, পোস্টার, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং স্মরণিকা সবকিছুর পিছনেই অর্থ। আবার নিজের দলের মেক-আপ ম্যান না থাকলে সেখানেও অর্থ দিতে হয়। দলের প্রধানরা চিন্তা করতে থাকেন কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এমন চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ অথবা স্পন্সর (Sponsorship) নিয়ে অর্থের যোগান দেওয়া। এতে দেখা গেলো একটি নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে অর্থের সংকুলান হয়েও কিছু অর্থ কম থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রযোজনার অর্থের ভার কোনো প্রতিষ্ঠানই নিতে ইচ্ছুক নয়। ফলে দলের চিন্তাভাবনায় ভাগ করা হলো টিকেট স্পন্সর করবে একটি প্রতিষ্ঠান, পোস্টার একটি প্রতিষ্ঠান এবং প্রযোজনাটি একটি প্রতিষ্ঠান। আর স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন চিন্তা নিয়ে পদক্ষেপ নিলো নাট্যদলের প্রধানরা। একটি স্মরণিকা প্রকাশের নানা দিক তারা চিন্তা করলো। একদিকে একটি প্রযোজনার সকল তথ্য থাকবে অন্যদিকে কিছু প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ছেপে অর্থের যোগান হবে। এমন চিন্তা থেকে স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা। প্রয়োজনীয়তা শুধু অর্থের নয়। একটি প্রযোজনার ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজন, যেখানে থাকবে স্মরণিকার মাধ্যমে নাটকের সার্বিক উপস্থাপনার ইতিহাস। স্মরণিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ডিজাইনার, স্মরণিকার প্রচ্ছদ শিল্পি। এই স্মরণিকার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নাট্য দলটি যাদের উপর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে সে সকল নাম। উৎসবকালিন (কয়েকটি প্রযোজনা নিয়ে) প্রযোজনার জন্য স্মরণিকা প্রকাশনাকালে তার রূপরেখা হয় অন্যরকম। একক নাটকের স্মরণিকার ক্ষেত্রে যে নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছে শুধুমাত্র সেই নাটকের বিষয় বস্তুনিয়ে প্রচ্ছদ তৈরি করা হয়। নাটকের পাত্র-পাত্রী, নির্দেশক ও নাট্যকার নেপথ্য কর্মীদেরও নাম উল্লেখ করা হয়। স্মরণিকার প্রথম মলাটে উৎসবের বিষয় বস্তু, দলের নাম, মনোগ্রাম এবং উৎসব লোগো, উৎসব তারিখসহ স্মরণিকা স্মরণিকায় উল্লেখ থাকে। মলাটের ভিতরের পাতায় একটি বিজ্ঞাপন এবং ক্রমনুসারে পৃষ্ঠাগুলো সাজিয়ে– উৎসবের মলাটে যা থাকে সেটি দিয়ে শুরু করা হয় উৎসব স্মরণিকা। এর পরে সম্পাদনা পর্ষদ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার, পর্যায়ক্রমে উৎসবে অংশগ্রহণকারি নাট্যদলের নাটকের নামসহ দলের নাম এবং প্রদর্শনির তারিখ ও স্থানের তালিকা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সূচি, সমাপনী সূচি, উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির

তালিকা। এরপরে উৎসব ঘোষণাপত্র, এবং যে বিষয়টি নিয়ে উৎসব করা হচ্ছে তার উপরে একটি নিবন্ধ। এছাড়াও উৎসবকে কেন্দ্র করে দলের প্রধান এবং নাট্যাঙ্গনের নাট্যব্যক্তিত্বদের লেখা, দলের কথা, দলের প্রযোজনাসমূহের তালিকা, এমনকী প্রতিটি প্রযোজনার পোস্টারসহ সকল তথ্য সংযোজিত হয়।

মঞ্চনাটকের স্মরণিকার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে নাট্যদলের নাট্যচর্চার দলিল। যে দলিল আগামি প্রজন্মের জন্য অতিব জরুরি। ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না, লিখিত ইতিহাস সবসময় বেঁচে থাকে। মৌলিক ভাবে যে ইতিহাস মানুষের কাছে পৌঁছায় তা আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে থাকে, স্মৃতি থেকে অনেকটাই হারিয়ে যায়। এমন একটি যুক্তিতে দাঁড়িয়ে মুদ্রিত একটা স্মরণিকা প্রকাশ থাকলে তা হয়তো তথ্য হিসেবে সংগৃহিত থাকবে। মঞ্চনাটকের স্মরণিকার আকার আকৃতি বৈশিষ্ট্য নানা ভাবে উপস্থাপিত হয়ে থেকে। দলের সিদ্ধান্তে স্মরণিকা, পোস্টারের আকার নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে বাংলাদেশ এবং বিদেশের দ ু'একটি স্মরিণকার এবং পোস্টারের নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

বিজয়ের ৪০ বছর মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি উৎসব শিরনামে স্মরিণকা প্রকাশিত হয়েছে তার আকার করা হয়েছে প্রস্থে **১৩.৫** সেন্টিমিটার আর দৈর্ঘ্য **২১** সেন্টিমিটার। স্মরণিকার বিষয় বস্তুকে মাথায় রেখে প্রচ্ছদ করা হয়। প্রচ্ছদের মধ্যে উঠে আসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই উৎসবে যে সমস্ত নাটক নির্বাচন করা হয়েছে তা স্বাধীনতার ৪০ বছরের সংস্কৃতি ইতিহাস অর্ন্তভূক্ত। এই নাটক গুলি মানুষের কাছে দর্শক প্রিয়তা থাকায় বারবার মঞ্চস্থ হয়েছে। বিজয়ের ৪০ বছর মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজক ছিল মাহাকাল নাট্য সম্প্রদায়।

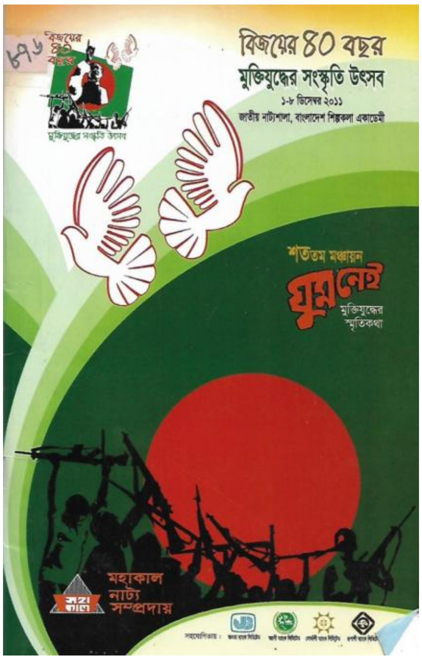

মহাকাল নাট্য সম্প্রদায় আয়োজিত বিজয়ের ৪০ বছর মুক্তিযোদ্ধের সংস্কৃতি উৎসব এর স্মরণিকা

এই উৎসবে যে সকল নাট্যদল অংশ গ্রহণ করে- লোক নাট্যদল (সিদ্ধেশ্বরী), ঢাকা থিয়টার, অনীক (কলকাতা) সময়, প্রাচ্যনাট, শুন্যন, কালচারাল ক্যাম্পাইন (ত্রিপুরা) বুনন থিয়েটার, থিয়েটার আর্ট ইউনিট, শব্দ নাট্যচর্চা কেন্দ্র, মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়, সুবচন নাট্য সংসদ, জেনেসিস থিয়েটার, থিয়েটার সার্কেল, মুন্সিগঞ্জ, মৈত্রী চিলড্রেন থিয়েটার ট্রুপস ও পিদিম থিয়েটার। এছাড়াও এই উৎসবে অর্ন্তভূক্ত ছিল আবৃত্তি, চলচ্চিত্র, জাদু, গল্পবলা, মূকাভিনয়। এই স্মরণিকায় উপস্থাপিত হয়েছে প্রতিটি নাটকের সারসংক্ষেপ। নাট্যদলের নাম, অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম, চরিত্রানুসারে এবং নেপথ্য কর্মীর নাম সহ উপস্থাপিত প্রয়োজনার একটি করে আলোকচিত্র। চার রং এর মলাটে উপস্থাপিত করা হয় স্মরণিকাটিতে। বিজয়ের ৪০ বছর মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতিক উৎসবের স্মরণিকায় ১৯টি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। সেই সাথে সহযোগীতা করেছে জনতা ব্যাংক মিলিমেটড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড।

'থিয়েটার' একটি নাট্যদলের নাম। ১৯৭২ এর ১৫ই জানুয়ারিতে এই দলটির প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা একাডেমির তদানীন্তন পরিচালক অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর অফিস কক্ষে কয়েকজন তরুন মিলিত হয়ে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠনটির মূলেছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। ১৯৭২ সালে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হবার পরেও নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেনি নানা জটিলতার কারণে। অবশেষে নিয়মিত যাত্রা শুরু করে ১৯৭৪ সারের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মুনীর চৌধুরীর নাটক 'কবর' দিয়ে। এরপর থেকে থিয়েটার নিয়মিত নাটক করে আসছে এযাবৎকাল।

থিয়েটার ১৯৭২-১৯৯৭ এবং নাটকের তালিকার স্মরণিকা

থিয়েটারের এই স্মরণিকাটির নাম করণ করা হয় 'থিয়েটার ১৯৭২-১৯৯৭'। এই স্মরণিকাতে থিয়েটারের প্রয়োজিত নাটকের তালিকা সহ প্রতিটি প্রযোজিত নাটকের ছবি সহ নাটকের সারাংশ এবং থিয়েটারকে নিয়ে নিবন্ধ রচিত হয়। এই স্মরণিকাতে নিবন্ধ লিখেছেন-রামেন্দু মজুমদার, আবদুল্লাহ আল-মামুন, আতাউর রহমান, কবীর চৌধুরী, মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং সৈয়দ শামসুল হক। উল্লেখ্য এই স্মরণিকাটির কোনো সম্পাদক নেই। কাজটি সম্পাদন হয়েছে থিয়েটার কর্তৃক। এছাড়া 'থিয়েটার ১৯৭২-১৯৯৭ স্মরণিকাটি বঙ্গ নাট্য সংহতি আয়োজিত থিয়েটারের নাট্যনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য স্মরণিকাটির প্রকাশ কালের কোনো সাল তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। থিয়েটারের দল থেকে শুধুমাত্র তাদের প্রযোজিত নাটকের রিভিউ, ছবি এবং থিয়েটারের ২৫ বছর পূর্ণ

হবার বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে। এই স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করে সোনালী ব্যাংক, এল,কিউ,এস. প্রোডাকশন্স, সিঙ্গার, থিয়েটার স্কুল, এছাড়া স্মরণিকার পৃষ্ঠপোষকতায় সোনালী ব্যাংক। স্মরণিকার আকার প্রস্থে ৮.৫ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্যে ১১.২ ইঞ্চি। চার রং এর ব্যবহার করা হয় কভারের। ভিতরের সম্পূর্ণই সাদাকালোয় মুদ্রিত। 'থিয়েটার' এর এই স্মরণিকায় তিনটি নাটকের তথ্য মুদ্রন করা হয়। ১. স্পর্ধা, ২ মেরাজ ফকিরের মা ৩, কোকিলারা। প্রতিটি নাটকের অভিনেতা নাট্যকার নির্দেশক সহ নেপথ্যের প্রয়োগ কারি সকলের নাম উল্লেখ করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কেন্দ্র ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ২০১১ সালে একক অভিনয় উৎসব আয়োজন করে। উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি চার রং এর স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এই উৎসবের শিরোনাম 'অভিনয়ে একক, রুপায়নের বিশ্ব'। স্মরণিকায় শুভেচ্ছা লিখিত বক্তব্য দেন রামেন্দু মজুমদার, আতাউর রহমান এবং লিয়াকত আলী লাকী। উৎসবে একক অভিনয় নিয়ে অংশ গ্রহণ করে থিয়েটার এর প্রযোজনা 'কোকিলারা' (২৩ এপ্রিল), ইসলাম উদ্দিন পালাকারের 'সায়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' (২৪ এপ্রিল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকালা বিভাগের 'বিফোর ব্রেকফাস্ট' (২৫ এপ্রিল), চারুনীড়মের 'নানা রঙেরদিন' (২৫ এপ্রিল) জিয়ন কাঠির 'স্ত্রীর পত্র' (২৭ এপ্রিল), পদাতিক নাট্য সংসদের 'তারামনবিবি' (২৭ এপ্রিল), সাধনার 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' (২৮ এপ্রিল) ড্রামা ডটকমের 'জানালায়' (২৮ এপ্রিল), নাগরিক নাট্যাঙ্গনের 'আমি বীরঙ্গনা বলছি' (২৯ এপ্রিল), ঢাকা থিয়েটারের 'বিনোদিনী' (৩০ এপ্রিল)।

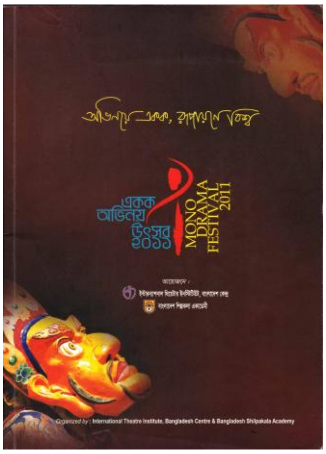

'অভিনয় একক, রূপায়নে বিশ্ব' একক অভিনয় উৎসব ২০১১ স্মরণিকা

এই স্মরণিকায় প্রতিটি নাটকের প্রসঙ্গ কথা, নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা এবং নেপথ্যের সকল কর্মীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি দলের পরিচিতি তুলে ধরা হয়। স্মরণিকাটিতে দুটি ভাষায় মুদ্রিত বাংলা এবং ইংরেজীতে। স্মরণিকাটি প্রকাশের জন্য দুটি বিজ্ঞাপন সংযুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপন দাতা এবি ব্যাংক ও স্ট্রান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড। স্মরণিকার আকার প্রস্থ ৭ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ৯.৪ ইঞ্চি।

কভার এবং বিজ্ঞাপন পাতাটি চার রং এ মুদ্রিত। ভিতরের সকল তথ্য সাদাকালোতে মুদ্রন করা হয়েছে।

পাশ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপালেও নাটকের স্মরনিকা, ফোল্ডার প্রকাশ করা হয়। সে ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের নাট্যদলেরই দু-একটা স্মরণিকা এবং ফোল্ডারের নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

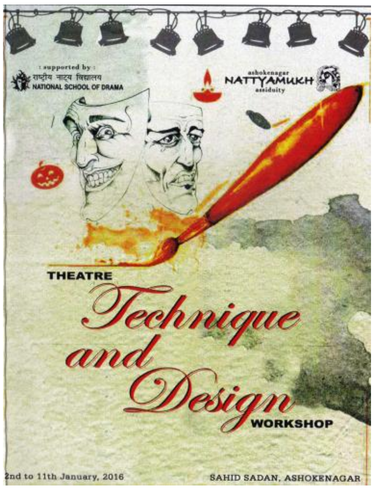

নাট্য ওয়ার্কসপের স্মরণিকা, ভারত (প্রস্থ ৫.৫ ও দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি)

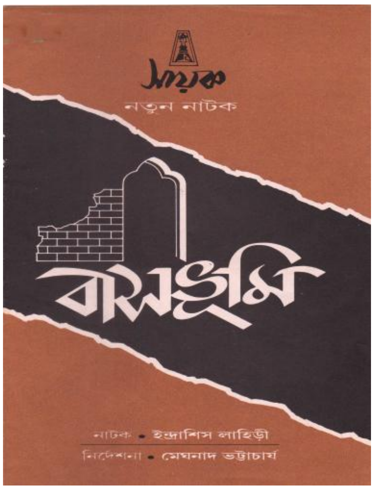

সায়ক এর বাসভূমি নাটকের স্মরণিকা (প্রস্থ ৫.২ ও দৈর্ঘ্য ৯ ইঞ্চি)

উৎসবকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হবে সে সকল নাটকের সারসংক্ষেপ, কুশিলবদের নাম, নেপথ্যের সকল তথ্য সংযুক্ত করা হয়। এছাড়াও আমন্ত্রিত নাট্যদলের লোগোও ছাপানো হয়। কিন্তু এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, এ সবকিছুর একটিই উদ্দেশ্য হলো স্মরণিকার মধ্য দিয়ে কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে অর্থের যোগান দেওয়া। উৎসবকে কেন্দ্র করে যে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়, তা একটি স্মরণিকাই শুধু নয়, সেটি একটি সময়ের দলিল হয়ে যায়। যদিও এই স্মরণিকার মাধ্যমে বেশ মোটা অংকের টাকা সংগ্রহ করা হয়, যে টাকার মধ্যদিয়ে উৎসবের অনেকটা খরচ যোগান হয়েও কিছু অর্থ দলের সঞ্চয় হিসেবে থেকে যায়। যা দলের পরবর্তী প্রযোজনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্মরণিকা প্রকাশের অনেকগুলো দিক লক্ষ করা যায়

দর্শকদের প্রয়োজনীয়তা, দলের তথ্য সংগ্রহ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, অর্থ সংগ্রহ, দলের সদস্যদের উৎসাহ প্রদান, দলিল রূপে সংরক্ষণ, নাটক সংরক্ষণ, প্রযোজনা সংরক্ষণ, প্রচ্ছদ শিল্পীর চিন্তা, বিজ্ঞাপন দাতা সংস্থাদের সাথে সম্পর্ক, ইতিহাস এবং বির্বতনধারা এমন বিষয়গুলো উঠে আসে একটি স্মরণিকার মধ্য দিয়ে।

দর্শকদের প্রয়োজনীয়তা

নাটকের একজন দর্শক স্মরণিকাটি অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করে এবং নাটক দেখবার আগে নাটকের সারসংক্ষেপ, কলাকুশলীদের তালিকা থেকে আরম্ভ করে নাটকের নানা তথ্য নিয়ে তিনি মিলনায়তনে প্রবেশ করছেন। নাটকের বিষয়বস্তুকে একজন দর্শক যখন প্রযোজনার সাথে মেলাতে থাকেন, তখন তিনি নাটকটি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও স্মরণিকার বিষয় নিয়ে ঐ দর্শক নানা জায়গায় আলোচনা করে থাকেন। স্মরণিকার সৌন্দর্য তাকে যখন আকৃষ্ট করে তখন নাট্যাঙ্গনের একজন দর্শক সংযোজিত হয়ে যায় নিজেরই অজান্তে। অর্থের বিনিময়ে স্মরণিকাটি সংগ্রহ করার কারণে কিছু অর্থ দলের সঞ্চয় খাতায় যোগ হয়। এছাড়াও দর্শক স্মরণিকাটি তার বাসায় নিয়ে বুকশেল্ফে রাখেন বা সংরক্ষণ করেন। স্মরণিকায় যে সমস্ত নাট্যজনের লেখা থাকে সেগুলো একটা মাত্রা তৈরি করে দর্শকের কাছে। মঞ্চনাটকের দর্শক সচেতন। কারণ তারা জানেন যে আজকের নাট্য প্রদর্শনীতে যে অভিনয় উপস্থাপন করা হবে তা আগামী প্রদর্শনীতে অনেকটাই পাল্টে যাবে। অনেক দর্শক আছেন যারা

একই নাটক একাধিকবার দেখে থাকেন। একইসাথে তিনি বুঝে নিতে চান নাটকের গল্পটি ঠিক আছে কি না। অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে একজন দর্শক থিয়েটার দেখেন। দর্শকের চোখে যা ধরা পড়ে তা হয়তো নির্দেশকের চোখ কখনো কখনো এড়িয়ে যায়। ফলে অনেক দর্শক আছেন যারা বিষয়টিকে নিয়ে নির্দেশকের সাথে সরাসরি আলোচনাও করেন। যে আলোচনা থেকে নির্দেশক তার অজানা অনেক চিন্তা সংযোজন করতে পারেন। ঐ দর্শক তার মুক্তচিন্তা থেকে স্মরণিকার সহযোগিতায় একটি সমালোচনাও লিখেন যা অনেক সময় দৈনিক পত্রিকাতে মুদ্রিত হতে দেখা যায়। এছাড়াও সাংবাদিকরা যখন দর্শকের মুখোমুখি হন প্রযোজনা নিয়ে, তখন দর্শকের হাতে থাকা স্মরণিকাটি অনেকক্ষেত্রে কাজে লাগে। একটি স্মরণিকা একজন দর্শকের হতে পৌঁছালে যেমন দর্শক লাভবান হন তথ্যগত থেকে, অন্যদিকে দল উপকৃত হয় অর্থের দিক থেকে।

দর্শকদের হাতে স্মরণিকা যাওয়া মানেই বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রচার। বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেয় তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি। এ ভাবেই একটি স্মরণিকা দর্শকের যেমন প্রয়োজন হয়ে ওঠে, তেমনি নাট্যদলের প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে স্মরণিকার মধ্যদিয়ে দলের প্রচার প্রসারের।

দলের তথ্য সংগ্রহ

স্মরণিকার মধ্যে যে সকল তথ্যাদি মুদ্রণ করা হয় তা থেকে বোঝা যায় সেই দলের কার্যক্রম। সেইসাথে দলের ভাব-অনুভবের কথা। দলের জন্ম থেকে স্মরণিকা প্রকাশকাল পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্যাদি থাকে সেখান থেকে একজন গবেষক তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, দলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে সমস্ত কর্মী সংযুক্ত থাকে অনেক সময় তাদের নামের তালিকা এখানে পাওয়া যায় যা আগামি দিনের কর্মীদের কাজে লাগে। দলের তথ্য সংগ্রহের মধ্যে স্মরণিকাতে পাওয়া যায় মঞ্চায়িত নাটকের ছবি, মঞ্চায়িত নাটকের পোস্টারের ছবি, নাটকের বিজ্ঞাপনের নমুনা এবং মঞ্চায়িত নাটকের সংক্ষিপ্ত নাট্য কাহিনি, কলা-কুশলিসহ নেপথ্য কর্মীদের নামসহ মঞ্চ ও সেটের বিবরণ। এমনকী দৈনিক পত্রিকাতে নাটকের সমালোচনা যে সমস্ত প্রকাশিত হয়ে থাকে, সেই সমালোচনাও স্মরণিকাতে স্থান পায়। এমন নানাবিধ তথ্যও স্মরণিকা বহণ করে বলে গবেষকদের কাজ একধাপ এগিয়ে যায়। দলের তথ্য থাকায় নাট্যকর্মীরা উৎসাহ পেয়ে থাকে বলে আজকের গ্রুপ থিয়েটারে এখন পর্যন্ত নাট্যকর্মীরা কাজ করে চলেছে। দলের তথ্য সংগ্রহের ফলে একজন নাট্যকার, মঞ্চপরিকল্পক, আলোক পরিকল্পক, পোষাক পরিকল্পক, প্রপস্ পরিকল্পক, সংগীত পরিকল্পক এমনকী মেকআপ পরিকল্পনা পর্যন্ত বেঁচে থাকে আগামী প্রজন্মের কাছে। নাট্যদলের স্মরণিকা যখন প্রকাশ হয়, তখন তার যে প্রচ্ছদ অংকন করা হয়, সেখানে একটা বড় ভূমিকা থাকে প্রচ্ছদ শিল্পীর। একইসাথে স্মরণিকার গেটআপ-মেকআপ থেকে আরম্ভ করে প্রুফরিডারের ভূমিকাও অপরিসিম। স্মরণিকা তৈরির ক্ষেত্রে যে সকল মানুষের ভূমিকা থাকে সেটি যখন তথ্যরূপে পরিগণিত হয় তখনই তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দলের সকল তথ্য সংগৃহীত হয়ে প্রকাশের জন্য সম্পাদকের হাতে যখন পৌঁছায় তখন সকল দায়ভার সম্পাদককে নিতে হয়। সকল তথ্যের সূত্র তিনি আরেকবার বিশ্লেষণ করেন। সেখানে কোনো তথ্য বিভ্রাট থাকলে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে তা পুণরায় সংযোজন করা হয়। এমন তথ্যই একটি দলের দলিলরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। দলের তথ্যের মধ্যে দলের নীতিমালা থেকে আরম্ভ করে দলের কমিটির একটি তালিকাও স্মরণিকায় স্থান পায়। যদি দলের কমিটি কখনো বদলানো হয়ে থাকে সেটিও তথ্যে সংযোজন করতে হয়। এছাড়াও দলের মিটিং থেকে আরম্ভ করে দলের বাৎসরিক হিসাবও সংযুক্ত হয় কখনো কখনো। নাট্যদলের কয়টি নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে এবং মঞ্চায়িত নাটকের সংখ্যা, তারিখ, এবং সাল উল্লেখ করা হয় দলের তথ্য অনুসারে। এমন তথ্য সমৃদ্ধ স্মরণিকা পাঠক ও গবেষকদের কাছে দলিল রূপে পরিগণিত হয়।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য

দলের নাট্য কর্মশালালায় যদি নাট্যকর্মির হাতে স্মরণিকা তুলে দেওয়া হয়, তবে সেই সকল নাট্যকর্মীরা জানতে পারে দল সম্পর্কে। কিন্তু অধিকাংশেই তা করা হয় না, কারণ হয়তো একটি স্মরণিকা মুদ্রিত সংখ্যায় সীমিত থাকায়। সেই ক্ষেত্রে দলের মধ্যে যদি কয়েকটিও স্মরণিকা রাখা যায় এবং কর্মশালার একটি পাঠচক্র হতে পারে স্মরণিকাকে কেন্দ্র করে, সেই কর্মীরা দলের অতীতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার কথা। বাংলাদেশে আগামী নাট্যকর্মী প্রজন্মের জন্য একটি গবেষণাগার অতিব জরুরি উপকরণ।

অর্থ সংগ্রহ

বর্তমানে একটি নাটক মঞ্চায়ন করতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। মহড়া থেকে শুরু করে মঞ্চস্থ হওয়া পর্যন্ত ধাপে ধাপে অর্থের যোগান দিতে হয়। নাটকের সেট, পোষাক, প্রপ্স এককালিন অর্থ দিয়ে তা তৈরি করে নিতে হচ্ছে। এছাড়া মেকআপ, হলভাড়া, সেট বহণ করার গাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে চা-পানের পর্যন্ত অর্থের যোগান রাখতে হয়। নাটকটি মঞ্চায়ন হওয়ার পূর্বে নাটকের লিফলেট, টিকেট, পোস্টার এবং দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেও অর্থের সিংহভাগ লেগে যায়। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে অনেক নাট্যদলই সাধ্যমতো কাজ করতে পারে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাটক চর্চা বেশিরভাগ হয়ে থাকে রাজধানীকেন্দ্রিক। সেখানেও মিলনায়তনের সংখ্যা কম থাকায় অনেক নাট্যদল নিয়মিত প্রদর্শনী করতে পারেনা। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তিনটি প্রেক্ষাগৃহ আছে। একটি মূল মিলনায়তন হল, একটি এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল, এবং স্টুডিও থিয়েটার হল। তিনটি মিলনায়তনের ভাড়া ভিন্ন ভিন্ন। অন্যদিকে মহিলা সমিতির 'নীলিমা ইব্রাহিমে মিলনায়তনে'র ভাড়া অনেকটাই বেশি। একটি নাট্যদলের প্রযোজনা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মঞ্চে মঞ্চস্থ করতে হয়। অর্থ সংগ্রহ করতে দল প্রধান এবং দলের সদস্যদের ভাবতে হয় এবং তখনই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে, একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে অর্থ যোগাড় করা যেতে পারে। একথা সত্য যে, হল ভাড়া এবং দৈনিক পত্রিকাতে নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়ার হার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সার্বিকভাবে প্রযোজনার খরচ বেড়েই চলেছে, অথচ টিকেট বিক্রি হচ্ছে না। দর্শক মঞ্চ নাটক থেকে অনেকটা বিমুখ। কোনো প্রতিষ্ঠান তেমন ভালো অংকের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেনা। সরকারি অনুদান নেই, যেটুকু অনুদান সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হয় তা নামে মাত্র।

নাট্যদল তাদের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। যে সমস্ত কর্মীরা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে নাম মাত্র একটা ফি গ্রহণ করা হয়। কারণ, যে সমস্ত ছেলে মেয়ে নাটক করতে আসে তারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের। সিংহভাগ নাট্যদলের ছেলে মেয়েরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসার কারণে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা আশা করা যায় না। তবে এর মধ্যে হাতে গোনা বেশ কয়েকটি নাট্যদলও আছে যাদের অর্থের চিন্তা করতে হয় না। চিন্তা করতে হয় না বিজ্ঞাপন সংগ্রহের। তাদের অনেকেরই বিজ্ঞাপন সংস্থা আছে এবং করপোরেট ব্যবসা আছে। বাস্তবতা হলো এটিই যে, সর্বশেষে অধিকাংশ নাট্যদলকে অপেক্ষা করতে হয় বিজ্ঞাপন সংস্থার উপর এবং কোনো ব্যক্তি সহযোগিতার উপর।

সদস্যদের উৎসাহ প্রদান

দলের সদস্যদের নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। একটি নাটক প্রযোজনার মধ্যদিয়ে তাদের সংযুক্ত করে, দলের নানাবিধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে উৎসাহ প্রদান করা হয়। কোনো সদস্য যদি প্রযোজনার সাথে সংযুক্ত না থাকে, তবে তাকে নেপথ্য কাজের মধ্যে সংযুক্ত করা হয়। যখন দলের

প্রযোজনা নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়, তখন সকল পাত্র-পাত্রী, কলা-কুশলীদের নামসহ দলের অন্যান্য সদস্যদের নাম ছাপিয়ে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। স্মরণিকাতে এমন কিছু ছবি ছাপানো হয়ে থাকে যেখানে দলের সকল সদস্য থাকবে এবং নাটকের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের ছবি ও নাম প্রকাশে দলের সদস্যরা উৎসাহিত হয়। শুধু তাই নয়, দলের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে সেখানে দলের সবাই মিলে এগিয়ে যায় সেই সদস্যের পরিবারের কাছে। দল একটি পরিবারও বটে। পরিবারের সদস্যের মতো দলের সদস্য। একজন কর্মীর অসুবিধায় যখন দলের সব সদস্য এগিয়ে আসে তখনই দলের সদস্যরা উৎসাহ পেয়ে থাকে। এ-ভাবেই দলের সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করা হয়।

দলিলরূপে সংরক্ষণ

পৃথিবীতে এ যাবৎ যে সকল দলিল সংরক্ষণ করা হয়েছে তার জন্য সংগ্রহশালা আছে। সংগ্রহশালা থাকার কারণে আজ আমরা ইতিহাসের সন্ধান পেয়ে থাকি। যেকোনো গবেষণাকর্মে পূর্ববর্তী তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অনেকভাবে নাটক উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ থিয়েটার, যাত্রা, পথ নাটক, মঞ্চ নাটক থেকে আরম্ভ করে তাৎক্ষণিক উপস্থাপনার নাটকও আমরা দেখতে পেয়েছি। এ ছাড়া শ্রুতি নাটকও উপস্থাপিত হয়েছে এবং এখনো করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো ধরনের সংগ্রহশালা সরকারিভাবে এখনো গড়ে ওঠেনি। সম্প্রতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভস' নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন ড. বাবুল বিশ্বাস। সেখানে মঞ্চ নাটকের স্যুভ্যনির, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, টিকেট, আমন্ত্রণপত্র, পেপার কাটিং, নাটকের ছবি, মঞ্চনাটকের ভিডিও সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া নাট্যকার, নির্দেশক, নির্দেশকদের জীবন বৃত্তান্তও সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই সংগ্রহশালা থেকে অনেক গবেষক সহযোগিতা গ্রহণ করেন। 'বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভস' এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি অনুদান পায়নি। ১৯৮৬ থেকে কাজটা শুরু করেন ড. বাবুল বিশ্বাস। ৯৮% ভাগ অর্থ খরচ করেন নিজস্বভাবে বাকি ২% ভাগ অর্থ অন্য জায়গা থেকে তাকেই সংগ্রহ করতে হয়। এখন এক কথায় বলা যায় নাটকের দলিল সংগ্রহ করতে হলে 'বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভস'র কাছে গবেষকদের যেতে হবে বা হচ্ছে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের অনেক নাট্যদল তাদের প্রযোজনার লিফলেট, স্মরণিকা সংরক্ষণ করে না। নাট্যদলের প্রধানরা বিষয়টি এখন পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিতে পারেনি। সম্প্রতি 'বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভস' পোস্টার, নাটকের ছবি, লিফলেট আন্তর্জাতিকভাবে প্রদর্শনী করার কারণে কিছু সংখ্যক নাট্যদল সচেতন হয়েছে দলের কাগজপত্র সংরক্ষণে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ২০০৫ সালে 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা' প্রকাশনা করে। সেই নির্দেশিকায় বাংলাদেশের নাট্যদলের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই নির্দেশিকার নতুন করে কোনো তথ্য সংযোজন করা হয়নি। দীর্ঘ ১৬ বছর অতিবাহিত হবার পরেও কোনো প্রকার তথ্য যোগ না হওয়ায় অনেক নতুন নাট্যদলের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবে থিয়েটারকর্মীতো বটেই, শিল্পানুরাগী, শিল্পসেবী সবার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা দিয়ে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান নির্দেশিকা প্রকাশ করে ন্যাটাঙ্গনকে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করেছে। এই কাজটির জন্য বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের মানুষ, সংগীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রকর্মী তথা সকল শিল্পীনুরাগী এ নাট্য নির্দেশিকার সুফল লাভ করতে পারছে। এই নির্দেশিকায় বাংলাদেশের প্রায় তিনশত নাট্যদলের পরিচিতি, যোগাযোগের ঠিকানা (বর্তমানে অনেক ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে), প্রযোজিত নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, যদি একটি নাট্যদলে পঞ্চাশজন করেও নাট্যকর্মী থাকেন তবে পনেরো হাজার সংস্কৃতিকর্মী অন্তর্ভুক্ত আছেন। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের এই নির্দেশিকা প্রকাশকালে একটি আহ্বায়ক কমিটি করা হয়, যেখানে আহ্বায়ক ম. হামিদ (২০০৫ সাল, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য) এবং সদস্য: লিয়াকত আলী লাকী (২০০৫ সাল বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সেক্রেটারী জেনারেল), শামীম আহসান (বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার

ফেডারেশানের গবেষণা সম্পাদক) ও আকতারুজ্জামান (বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের অনুষ্ঠান সম্পাদক)। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান (২০০৫) মামুনুর রশীদ সভাপতিমণ্ডলীর বক্তব্যে বলেন:

> ...অনেক প্রত্যাশার পর গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশ বিলম্ব হওয়ার কারণ একটিই তা হল নাট্য কর্মীরা নাটকে যতো উৎসাহ বোধ করেন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তাঁদের ততই অনীহা। তথ্য পাওয়া যে কঠিন কাজ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন এই নির্দেশিকার কর্মীরা। অবশ্য সবাইকে দায়ী করা ঠিক হবে না। কেউ কেউ যথা সময়েই পাঠিয়েছেন। আরেকটি সমস্য হচ্ছে তথ্যগুলিকে হালনাগাদ করা। সে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। তবুও আমরা কাজটি কোন মতেই আর বিলম্বিত করতে চাইনি। তবে যতটুকু তথ্য আছে তার সাথে ভবিষ্যতে নতুন সংযোজনের সুযোগ রইলো... ।[৬]

উপরিউক্ত বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে মামুনুর রশীদ বুঝিয়ে দিয়েছেন নাট্যদলের প্রধানদের তথ্য সংরক্ষণের অনীহার কথা। তথ্যসম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে কত যে কাঠ-খড় পোড়াতে হয় তা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সেক্রেটারি জেনারেল (২০০৫), স্মরণিকায় বক্তব্য লিয়াকত আলী লাকী বলেন:

> ...সদিচ্ছা ও চেষ্টা থাকার পরও কিছু ত্রুটিও মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে যেতে পারে। কোন দলের তথ্য ঘাটতি, খণ্ডিত তথ্য বা তথ্যের বিভ্রাট থাকলে, কোন দল বাদ পড়ে থাকলে তা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করে পূর্ণাঙ্গরূপে ছাপার সুযোগ রইল। এ ধরনের 'নির্দেশিকা' প্রতি মুহূর্তে বেড়ে ওঠা চলমান প্রক্রিয়ার একটি প্রতিরূপ বলে এতে সংযোজনের ক্ষেত্র সবসময় উন্মুক্ত... ।[৭]

লিয়াকত আলী লাকীর মন্তব্যে এটিই প্রকাশ পায় যে, ভবিষ্যৎ এ আরেকটি নির্দেশিকা প্রকাশ পাবার অপেক্ষায়। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে ২০২১, ১৬ বৎসরের মধ্যে কোন নির্দেশীকা প্রকাশ হয়নি। এরই মধ্যে বাংলাদেশে অনেক নাট্যদল, অনেক নাটকের প্রযোজনা হয়ে গেছে যা তথ্যের বাইরে। বর্তমানে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানকে এগিয়ে আসতে হবে নতুন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য।

নাটক সংরক্ষণ

নাটক সংরক্ষণের জন্য স্মরণিকার ভূমিকা যে খুব একটা আছে তা নয়। তবে প্রযোজিত নাটকের সারসংক্ষেপ, নির্দেশকের কথা, নাট্যকারের কথা, নাটকের চরিত্রের নাম, প্রযোজিত নাটকের সাথে সকল কর্মীর নামসহ যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় তা অবশ্যই আগামী প্রজন্মের জন্য নাটকের থিয়েটারের তথ্য জানবার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

নাটকটি কোন সময়ের লেখা, বিষয়বস্তুর নানা দিকগুলো উঠে আসে স্মরণিকার তথ্য থেকে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যখন একটি নাটকের মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে এবং ঐ নাটক রচনাকাল থেকে বোঝা যায় দেশের সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান কী। এভাবে দেশের অবস্থান সম্পর্কে বোঝা যায় একটি নাটক থেকে এবং প্রযোজনাকালে একজন নির্দেশক যখন সেই নাটকের বিশ্লেষণ করেন এবং প্রয়োগ করে মঞ্চে এনে দর্শকদের মুখো-মুখি হয়, তখন আরেক ধরণের সমালোচনা তৈরি হয় সাধারণ দর্শকদের কাছে।

প্রযোজনা সংরক্ষণ

নাট্যদল বেঁচে থাকে প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। একটি ভালো প্রযোজনা মঞ্চে মঞ্চস্থ হলে তখন সাধারণ দর্শকের কাছে ভালো লাগলে, তখনই প্রযোজনার সার্থকতা। সার্থকতার ছোঁয়া দলের মধ্যে উৎসাহ আনে থিয়েটার করার। ফলে নাট্যদল থেকে প্রযোজনাটি সংরক্ষণের জন্য স্থিরছবি, ভিডিও করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগতভাবে সংগঠন এই কাজটি দলের অর্থ থেকে সম্পন্ন করে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রযোজিত মঞ্চ নাটক সংরক্ষণ করার তেমন কোনো উদ্যেগ নেই। ফলে

আগামী প্রজন্ম কখনোই মঞ্চ নাটকের ইতিহাস খুঁজে পাবে না। এর ইতিহাস একমাত্র বহন করে থাকে প্রযোজনার মুদ্রিত স্মরণিকা। প্রযোজনাটি মঞ্চে আসবার আগে একটি স্মরণিকা, লিফলেট, টিকেট, পোস্টার ছাপানো হয়। আর এগুলোই প্রযোজনাটির একমাত্র প্রমাণ পত্র। এভাবেই বর্তমানে একটি প্রযোজনার ইতিহাস সংরক্ষণ হয়ে আসছে।

প্রচ্ছদ শিল্পীর চিন্তা

"শিল্প মানব মনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ এবং সেই শিল্পকে সৌন্দর্যের নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় যে শাস্ত্রে, তার নাম নন্দনতত্ত্ব।"[৮]

একজন শিল্পী তার চিন্তাভাবনা থেকে মনের মধ্যে তার সৃষ্টির একটা রূপ তৈরি করেন। একজন প্রচ্ছদ শিল্পীকে একটি নাটক দিয়ে বলা হয় একটি পোস্টার তৈরী করে দেবার জন্য। তিনি নাটকটি পাঠ করবেন এবং তার মূল বিষয়বস্তু বুঝে পোস্টারের কল্পনা তৈরি করবেন। এরপর সংগঠক নির্দেশকের সাথে তার ভাবনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করবেন। উভয়ের আলোচনার মধ্যদিয়ে শিল্পীর কাছে যা যুক্তি-যুক্ত মনে হবে, সেটিই তিনি করবেন। একজন শিল্পীর চিন্তার বিস্তার শুধু নিজের জন্যেই নয়, তার চিন্তার ফলাফল সকল মানুষের জন্য। তিনি ঐ নাটকটি নিয়ে এমনভাবে বিশ্লেষণ করবেন যাতে ঐ পোস্টারের মধ্যদিয়ে একটি গল্প পাওয়া যায়। শুধু গল্পই নয়, সেখানে উঠে আসবে বর্তমান সমাজের রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র। একজন শিল্পীকে যখন স্মরণিকার প্রচ্ছদ আঁকবার জন্য দেওয়া হয় তখন তাকে নানাবিধ চিন্তা করে আঁকতে হয়। উৎসব স্মরণিকায় বেশকিছু নাটকের দল অংশগ্রহণ করে থাকে, ফলে সেখানে স্মরণিকার প্রচ্ছদ ভিন্নরূপে উপস্থাপন করা হয়। শিল্পী তখন ভাবেন উৎসবের বিষয়, কীসের জন্য উৎসব, উৎসবকে কেন্দ্র করে কোনো বিষয় বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে কি না। উৎসবের একটি শ্লোগান থাকে এবং শিল্পী ঐ শ্লোগানকে মূখ্য বিষয় হিসেবে ধরে প্রচ্ছদ এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে শিল্পীর একটা ভাষা আছে যা তার কর্মে প্রকাশ পাবে এবং মানুষ তার নন্দনতত্ত্বটি খুঁজবে তার শিল্পকর্মে। কারণ শিল্প মানবিক সৃষ্টি বলে কোনো না কোনোভাবে এতে জীবনের প্রসঙ্গ থাকবেই। ফলে সাধারণ মানুষ খুঁজতে থাকবে শিল্পীর কাজের মধ্যে জীবনের মূল্যবোধ। আর তাই একজন শিল্পী প্রচ্ছদে নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস যা কিছুরই হোকনা কেনো তার শিল্পকর্মে আমাদের বস্তুজগতের যা কিছু দৃশ্যমান তাদের দেখা, তাদের চরিত্র, রূপ অনুধাবন করা, তাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সম্পর্কসমূহ তলিয়ে দেখা। তারপরে উপস্থাপন করে একটি প্রচ্ছদ। তবে এ কথা সত্য যে সকল শিল্পের উৎপত্তিস্থল মানুষের মন।

কারক নাট্যসম্প্রদায় প্রযোজিত নাটকের পোস্টার 'নির্বাসন দন্ড' নাট্যকার ও নির্দেশক- শংকর সাওজাল, প্রথম মঞ্চায়ন ১৯৮৬, ঢাকা।

শংকর সাঁওজালের নাটক নির্বাসন দন্ড'র প্রচ্ছদ শিল্পী অশোক কর্মকার যেভাবে প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন তাতে প্রতিয়মান হয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।

একজন শিল্পী তার কাজের মধ্যে কখনোই হুবহু কোনো কিছুই উপস্থাপন করেন না। শিল্পী তার সুন্দরের অনুসন্ধানে বর্ণনাকে বাদ দিয়ে প্রতীককে বেছে নিয়েছেন, কারণ চূড়ান্তকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করবে তেমন ভাষা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে একথা ঠিক যে শিল্পের প্রকৃত সত্ত্বাটি স্বাধীন বলে যে রীতিনীতি বা নিয়ম-শৃঙ্খলা তা নিজে সৃষ্টি করেন। স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, তাতে শিল্পের কোনো ক্ষতি হয় না বরং এতে প্রকাশ বৈচিত্র্য ও আবেদন বাড়ে।

শিল্পের যে প্রধান দুটি ধারা তাদের চারুশিল্প (Fine Arts) ও কারুশিল্প (Crafts) বলে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। কারুশিল্প উপাদানসমূহ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত, তাতে কল্পনার এক প্রস্থ রঙ চড়িয়ে শিল্প সৃষ্টি করা যায়; সেখানে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ সব সময় প্রয়োজন হয় না। চারুশিল্প শিল্পীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টির কোনো ব্যহ্যিক প্রয়োজনীয়তা নেই; সৃষ্টির গূঢ় তাগিদ থেকেই তার উৎপত্তি। কারুশিল্প শিল্প বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এর উৎপত্তি জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন থেকে। চারুশিল্পের অধীনে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রায় সবই অন্তর্ভুক্ত।

আমরা জানি সুন্দরের সাধনায় শিল্পীকে তিনটি স্তরে পার হতে হয়। প্রথমত সৌন্দর্যের আভাসটি উপলব্ধি করা এবং একটি অস্ফুট রূপ কল্পনা করা, অথবা এই রূপের ব্যঞ্জনা অনুভব করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুভূত ব্যঞ্জনাটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যানের বস্তুতে পরিণত করে তাকে অভিজ্ঞতার পর্যায়ে নিয়ে আসা; এবং সর্বশেষ তাকে রূপ বা form এ বিন্যস্ত করা ও রসসিক্ত করা। তৃতীয়ত শিল্পীর প্রকাশ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে শিল্পবস্তু ও শিল্পগ্রহীতার সম্পর্কটি স্থাপিত হয়। কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো শিল্পীর অনুধাবনের প্রকৃত প্রতিরূপটি অর্জন, যা প্রকাশের মাধ্যমে সম্ভব।

শিল্পী যখন একটি স্মরণিকার প্রচ্ছদের জন্য চিন্তা করেন তখন তাকে ঐ স্মরণিকায় কি কি বিষয় মুদ্রণ হবে তা তাকে সমস্তটাই জানতে হয়। এছাড়া স্মরণিকার আবার কিরূপ হবে, স্মরণিকার উদ্দোশ্য কি এ সমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। শিল্পীর চিন্তার বহিঃপ্রকাশে একটি স্মরণিকা মানুষের কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে। স্মরণিকার প্রচ্ছদটির সঙ্গে বিশেষ শ্লোগান, দলের মনোগ্রাম, দলের নাম থেকে আরাম্ভ করে নানা বিষয় প্রচ্ছদে সংযোক্ত হয়। ফলে শিল্পীকে প্রচ্ছদের চিন্তার সাথে তাকে এগুলোও ভাবতে হয়। সর্বমোট একজন প্রচ্ছদ শিল্পীর চিন্তায় একটি উৎসবের সার্বিক ইতিহাস তৈরি হয় সেই স্মরণিকায়।

বিজ্ঞাপন দাতা

স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে তেমন কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থা গড়ে উঠেনি। ফলে ১৯৭১ সালের দিকে যে সমস্ত নাটক, নাটকের উৎসব হতো তা বেশিরভাগই 'লিফলেটের' মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপন করা খুবই দুরোহ কাজ ছিল। তবে সেটি সম্ভব হয়েছে কিছু নাটক প্রিয় মানুষ থাকার জন্য। তারা নাটক করতো মনের, প্রাণের টানে। এই নাটক থেকে কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না। সময়কে ধরে নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্বাচন এবং অভিনয়। স্বাধীনতা পরবর্তী বেশ কিছু সময় মঞ্চ নাটক সময়কে ধরে রেখেছিল। নাটকের বিষয়বস্তু দেখলেই বোঝা যেতো কোন সময়ের নাটক। একসময় নাট্যদলগুলো যখন নিজের পয়সা দিয়ে মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করতে পারছেনা তখন সহযোগীতার জন্য ছুটতে হলো কোনো বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছে। দলের প্রধানরা নিজেদের পরিচিতদের মধ্যে দু'এক জায়গায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থের কথা বলায় বিজ্ঞাপন সংস্থার নানা প্রশ্ন-উত্তরে যদি উত্তীর্ণ হওয়া যেতো তবেই একটি বিজ্ঞাপন মিলতো। সামান্য অর্থের জন্য ছুটতে হয়েছে নানা সংস্থার কাছে। শুধু

বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার কাছেই নয় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কাছেও বিজ্ঞাপনের জন্য যেতে হয়েছে। প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিছু অর্থ দিয়ে নাটককে একপ্রকার বাঁচিয়ে রেখেছিল। এমনকি অনেক সংস্থা কখনো-কখনো (মানুষ বিশেষে) পুরো নাট্যোৎসবকেই স্পসর করে থাকে। তবে এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেই জায়গাটি তৈরি হয়ে ওঠেনি যে বিজ্ঞাপন সংস্থা এসে বলবে, আপনার স্মরণিকার প্রথম পাতাটা রাখবেন আমার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের জন্য। অথবা আপনার নাট্যোৎসবের পুরো অর্থের দায়ভার আমার প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু পার্শবর্তীদেশ ভারতের নাট্যদলগুলো অনেকটায় এ বিষয়ে এগিয়ে। ভারত সরকার নাট্যাঙ্গনের জন্য অর্থ প্রদান থেকে আরম্ভ করে নাটক প্রযোজনার সকল ব্যয় বহন করে থাকে। তবে সরকার তাবেদারি নাট্যদল গুলির সংখ্যায় বেশি। অন্যদিকে ভারতের অনেক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষায় থাকে কোনো নাট্যেৎসবকে স্পন্সর করার জন্য। বাংলাদেশে এখনো বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এমনটা হয়ে ওঠেনি। স্মরণিকার জন্য বিজ্ঞাপনের আশায় দশ প্রতিষ্ঠানে দৌড়ালে হয়তো তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। এমনি করে দলগুলো নাটক নিয়ে বেঁচে আছে। এখন একটি বিষয় যে, আজ যারা বিজ্ঞাপন বা অর্থ দেবার ক্ষমতা রাখেন তাদের নাট্যদল অথবা নাট্যাঙ্গনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করা যাচ্ছে না কোনো? আমাদের ভাবতে হবে তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে নাটকের সঙ্গে থাকার জন্য মনোভাব তৈরি করানোর। এমন মানুষগুলো যদি এগিয়ে আসে তবে সুন্দরভাবে একজন নাট্যকার নাটক রচনা করতে পারবেন। একজন নির্দেশক নির্দেশনা দিতে পারবেন, অভিনেতা প্রাণ খুলে অভিনয় করতে পারবেন। একটা স্মরণিকার প্রকাশের পিছনে বিজ্ঞাপন সংস্থার অবদান অপরিসীম। স্মরণিকা প্রকাশের কারণে বেঁচে থাকে একটি নাটক এবং প্রযোজনার ইতিহাস।

ইতিহাস এবং বিবর্তন ধারা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করাই মানুষের স্বভাব। এভাবে বাস করতে হলে চাই একে অন্যের সহযোগীতা। আর তাই মানুষের প্রয়োজন পড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। এই পৃথিবীতে জীবন বাঁচাতে প্রধান তিনটি জিনিসের প্রয়োজন– খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। এর পরই মানুষ জীবনকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে মনোযোগ দেয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন প্রভৃতির উন্নয়নে। সমাজ জীবন বিকাশে মানুষের এসমস্ত কাজকর্মের একত্রিত রূপই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার প্রাচীন মানুষ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়েতোলে। বাংলার সমাজ সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ। পণ্ডিতদের মতে, এদের ভাষার নাম ছিল 'অস্ট্রিক'। জাতি হিসেবে এদের বলা হতো নিষাদ। এরপর বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায় 'আলপাইন' নামে এক জাতি। আর্যরা এদেশে আসার পূর্বে এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বাঙালির জন প্রকৃতিতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে। এটি তাদেরকে 'সংকর-জন' হিসেবে পরিচিত করেছে, বহু বছর বিচিত্র আদান-প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙালির একটি নিজস্ব দৈহিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে আরও নানা প্রকার সংকর অর্থাৎ মিশ্র জাতি এবং সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা-পার্বণ করা এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। তারাই সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতো। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোট-খাটো কাজ করতো। ব্রাহ্মণ ছাড়া সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করতো। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রভাবে সেনদের সময়ে সাধারণ হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রাচীন বাংলার শেষ পর্যায়ে এ বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুসলমান সমাজের ভিত গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয়। আর এ যুগে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির রূপও পাল্টে যায়।

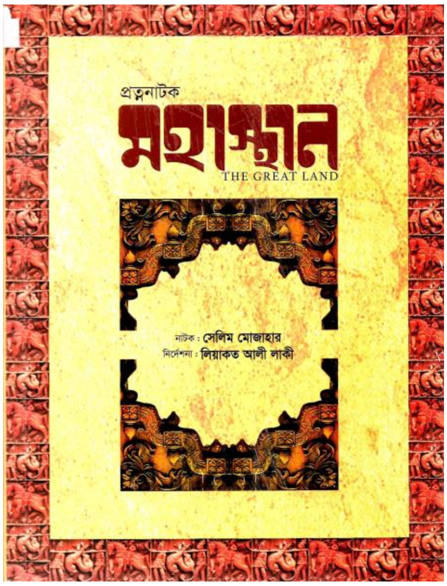

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা- প্রত্ননাটক মহাস্থান নাটকের স্মরণিকা (নভেম্বর ২০১৮)

ইতিহাস এবং বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সংরক্ষণের অভাবে এসব শিল্পকলা ধ্বংস হয়ে গেছে, বর্তমানেও যাচ্ছে। ইতিহাসের ধারা ধরে যখন বিবর্তন খুঁজতে যায় শিল্পীর কাজের মধ্যে একজন পর্যবেক্ষক, তখন সেই খোঁজার মধ্য থেকে বেড়িয়ে আসে অন্যচিন্তা-অন্যভাবনা। একটি স্মরণিকা প্রকাশ জাতির জন্য কত যে প্রয়োজন তা মর্মে মর্মে স্মরণ করতে হয় একজন গবেষককে। আজ অনেক ইতিহাস আমাদের অজানা, কারণ কোনো মুদ্রিত ইতিহাস নেই। যতটুক ইতিহাস পাওয়া যায় তা স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং 'অষ্টাসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথি থেকে।

পথ নাটকের চিত্র

১৯৭১ এর থেকে অনেক নাটক পথে, মাঠে, মঞ্চে হয়েছে কিন্তু কোনো প্রকাশনা না থাকায় আজ অনেক তথ্যই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৭১ পরবর্তী কালখণ্ডে বাংলাদেশের নাটকের একটি অন্যতম প্রবণতা হয়ে উঠল ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরানের নব-মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এবং এভাবেই ইতিহাস ঐতিহ্যের কঙ্কালে সমকালকে ধারণ করতে চাইলেন আমাদের কয়েকজন নাট্যকার। তবে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নিজেদের দিকে তাকাবার একটা বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা ভাবতে থাকি আমাদের কী আছে? আছে একটা শক্ত সংস্কৃতিক ভিত্তি। তার মধ্যে আছে নাটক।

সর্বশেষে বলা যায় একটি স্মরণিকায় ইতিহাস যেমন সংরক্ষিত হয়, তেমনি এটি একটি দলের জন্য অনেক অর্থের যোগান দিয়ে থাকে বিজ্ঞাপন এবং পৃষ্টপোষকতার মাধ্যমে। নাট্য স্মরণিকার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে নাট্যাঙ্গনে। নাটকের স্মরণিকা, টিকেট, পত্রিকায় নাটকের সমালোচনা, দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানো এ সবই ছাপার অক্ষরে থাকার কারণে তথ্যসমৃদ্ধ হয় এবং আগামী প্রজন্মের জন্য এই তথ্যগুলো কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস করি।

তথ্যনির্দেশ

১ https://www.hindustan-times.com/photos /lifestyle/far-from-tosy-art-that-political-and hits-you-hard/photo c15007qfyxx2 patMGJBdwM.htm.

২ Oral Traditions and the verbal arts: A quid to research practice. সৌমিত্র বসু, আজকের অথবা আগামীকালের থিয়েটার, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা (দশম সংখ্যা), নৃপেন্দ্র সাহা, চন্দন সেন (সম্পা.), প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী, ভারত, ২০০৪, পৃ. ৮৬-৮৭

৩ জিয়া হায়দার, বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা, *বাংলাদেশের থিয়েটার*, প্রকাশক নওরজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১

৪ তদেব, পৃ. ৩

৫ রামেন্দু মজুমদার, *বিষয় : নাটক*, (প্রকাশক মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭), পৃ. ৭৮

৬ মামুনুর রশীদ, সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান এর বক্তব্য, বাংলাদেশ গ্রুপথিয়েটার নির্দেশিকা, সম্পাদক ম. হামিদ, (প্রকাশক: বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ঢাকা ২০০৫

৭ লিয়াকত আলী লাকী, সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা, সম্পাদক ম. হামিদ, (ঢাকা: বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ২০০৫

৮ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দন* তত্ত্ব, (ঢাকা: কথা প্রকাশ, বাংলা বাজার, ২০১৯), পৃ. ১১